অটিজমের বৈশ্বিক ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত: কিছু বাস্তবতা

আফরোজা বেগম*

সারসংক্ষেপ: অটিজমের বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে আলেকপাত করার পাশাপাশি চিকিৎসা বিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী বিশেষভাবে সমাজবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানীদের অটিজম সম্পর্কিত ধ্যান ধারণা এ নিবন্ধে উপস্থাপিত হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের ধ্যান ধারণা পর্যালোচনা করার সাথে সাথে বাংলাদেশে বিরাজমান রূঢ় বাস্তবতায় অটিজমে আক্রান্ত শিশুদের চিকিৎসা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনে কি পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরী তা এ নিবন্ধে বিধৃত হয়েছে। মূলত: গুণগত পদ্ধতি নির্ভর এ গবেষণা নিবন্ধটির তথ্য ও উপাত্ত প্রয়োজনে পরিমাণগত পদ্ধতির মাধ্যমে ও সংগৃহীত, বিশ্লেষিত ও সংশ্লেষিত হয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় ৫টি জোরালো যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে। তা হলো (ক) অটিজমের উপসর্গ অন্যান্য উন্নত-অনুন্নত দেশের মত বাংলাদেশেও এক ও অভিন্ন। (খ) অটিজম বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি। (গ) শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে বাংলাদেশের অগ্রগতি আজ বিশ্বে সমাদৃত। (ঘ) একটি বিশেষ ধরনের অসুস্থতা, জনস্বাস্থ্য সমস্যা, এবং মানবাধিকার বাস্তবায়নের প্রশ্নে বাংলাদেশ এখনো অনেক পিছিয়ে আছে। (ঙ) এ পরিপ্রেক্ষিতে সুনির্দিষ্ট কিছু কর্মসূচীর সুপারিশ রয়েছে এ নিবন্ধনে। তবে এ নিবন্ধে দ্ব্যর্থহীনভাবে এ উপসংহার গৃহীত হয়েছে যে, একজন অটিষ্টিক শিশুর সামাজিকীকরণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনে তার পিতা-মাতাকেই নিতে হবে বলিষ্ঠ ভূমিকা। এ লক্ষ্যে তাদেরকে মানসিকভাবে উজ্জীবিতকরণ, প্রশিক্ষণ, আর্থিক সমর্থনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কর্মসূচী গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নে সরকারী-বেসরকারী মহলকে এগিয়ে আসতে হবে।

মূল শব্দ : অটিজম, সামাজিকীকরণ, জনস্বাস্থ্য, রোগ নির্ণয় তত্ত্ব, মিশ্র পদ্ধতি, IPNA.

চিকিৎসা শাস্ত্র, সামাজিক বিজ্ঞানে বিশেষতঃ নৃবিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞানীদের জন্য অটিজম এখন বহুল আলোচিত এবং বিতর্কিত বিষয়। মূলতঃ এসব আলোচনা এবং বিতর্ক তিনটি জিজ্ঞাসাকে ঘিরে আবর্তিত (American Psychologlical Association, 2014):

১) এটা কি কেবলমাত্র মানসিক বিকাশজনিত সমস্যা?
২) এটা কি মারাত্মক কোন শারীরিক অসুস্থতা?
৩) এটা শারীরিক বা মানসিক কোন অসুস্থতাই নয়; একটি সমাজ অটিস্টিক শিশুকে কি চোখে দেখছে, অটিজমকে কিভাবে গ্রহণ করছে তার উপরই নির্ভর করে এটা আদৌ একটি সমস্যা নাকি শারীরিক অসুস্থতা।

চিকিৎসা শাস্ত্রের মতে এটা অবশ্যই এক ধরনের অসুস্থতা। তাই এর লক্ষণ ও মাত্রা নির্ধারণের জন্য তারা একটির পর একটি DSM[1] উদ্ভাবন করছেন। অপরদিকে, মনোবিজ্ঞানীরা এটাকে মানসিক বিকাশজনিত সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে একটির পর একটি Therapy উদ্ভাবন করছেন (American Psychiatric Association, 2000)।

নৃবিজ্ঞানীরা কোন্ সমাজ অটিজমকে কোন্ চোখে দেখছে পাশাপাশি বংশগতি, বিশেষ কোন জীন, পারিবারিক-সামাজিক কোন সম্পর্ক এসব এথনোগ্রাফিক উপাদান অটিজম সৃষ্টির জন্য দায়ী কিনা তার অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছেন এবং ইতিমধ্যে অনেক নৃবিজ্ঞানী (McDermott: 1995, Knott, 2006; Grinker, 2007; Freeman, 2007) বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন যে, সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার

* ড. আফরোজা বেগম, অধ্যাপক, সমাজকর্ম বিভাগ, ইডেন মহিলা কলেজ, ঢাকা।

আওতায় একজন অটিস্টিক শিশুকে অন্তর্ভূক্ত করা হলে তার মধ্যকার শারীরিক অসুস্থতা এবং তার মধ্যে মানসিক বিকাশজনিত যে সমস্যা রয়েছে তা অনেকখানি নিরসন করা সম্ভব।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, অটিস্টিক শিশুরা আমাদের সমাজেরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, অন্যান্য শিশুদের ন্যায় তাদেরও প্রয়োজন উপযুক্ত সুযোগ এবং সহায়তা, তবে সেটি হতে হবে বিশেষ ধরনের। মায়ামমতায় ঘেরা, বিশেষ ধরনের যত্ন ও সেবায় ভরা। এই সেবা প্রসারিত করতে হবে অনেক দূর, স্কুলের গণ্ডি থেকে ঘুমন্ত অবস্থা পর্যন্ত (from bench to the bed side) (Conn, 2006). তবে প্রত্যেকটি স্তরে সামাজিকীকরণের প্রাধান্য রয়েছে। শিশু হিসেবে জন্ম নিয়ে গৃহ থেকে যাত্রা শুরু করে বৃহত্তর সমাজে প্রবেশাধিকারের যোগ্যতা অর্জনের জন্য প্রত্যেক শিশুকেই যে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয় সেটাই হলো সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া। এই সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় রয়েছে নানা ধরনের স্তর ও বিভাজন (Kern, 2010). তবে সার্বিকভাবে প্রধান দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-শিশুতোষ সামাজিকীকরণ (Child Socialization) এবং বয়স্থ সামাজিকীকরণ (Adult Socialization)। অন্যান্য স্বাভাবিক শিশুদের থেকে অটিজমে আক্রান্ত শিশুদের মধ্যকার সামাজিকীকরণের মধ্যে মৌল পার্থক্য হলো স্বাভাবিক শিশুদের শিশুতোষ সামাজিকীকরণের পরবর্তী পর্যায়ে সামাজিকীকরণের আর তেমন প্রয়োজন হয় না। কিন্তু একজন অটিস্টিক শিশুকে শিশুতোষ এবং বয়স্থ সামাজিকীকরণ দু'টো প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই অত্যাবশ্যকীয়ভাবে যেতে হয়। এটাই হলো প্রকৃত বাস্তবতা। কিন্তু অটিস্টিক শিশুর মাতাপিতা দীর্ঘদিন যাবৎ জানতেই পারে না যে তাদের সন্তান অটিজমে আক্রান্ত একজন শিশু, তার জন্য প্রয়োজন বিশেষ ধরনের সামাজিকীকরণ। যখন তারা জানতে পারে যে তাদের সন্তানটি অটিস্টিক তখন থেকেই শুরু হয় তাদের সবচেয়ে ক্লেশ ও কষ্টকর অভিযাত্রা।

ঐতিহাসিকভাবে জন হফকিনস্ হাসপাতালের চিকিৎসক লিও ক্যানার সর্বপ্রথম ১৯৪৩ সালে 'অটিজম' শব্দটি ব্যবহার করেন। ইতোমধ্যে ৭৭ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, তথাপি এ সমস্যাটি কি কারণে হয়, কোন্ কোন্ উপাদান কিংবা অবস্থা এর পেছনে দায়ী সে বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোনো সুনির্দিষ্ট বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্যপ্রমাণাদি উপস্থাপন করা সম্ভব হয়নি। এ যাবৎ 'অটিজম' হওয়ার পেছনে অনেকগুলো কারণের কথা বলা হলেও এক্ষেত্রে রোগ নির্ণয় তত্ত্ব (Etiological Theory) এখনও পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়নি (Newschaffer et al., 2009)। বিভিন্ন দেশে এ যাবৎ পরিচালিত গবেষণালব্ধ ফলাফল (Srivastava & Walker, 1999; Gallagher, 2004; Chilvers, 2007; Chakrabarti et al, 2009; The National Autistic Society, 2012; Koegel et al., 2013) থেকে অটিজমের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যা জানা যায় তা হলো এটি বিচিত্র ধরনের উপসর্গ এবং ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণসম্পন্ন শারীরিক ও মানসিক ব্যাধি যা অবস্তুগতভাবে (Subjectively) অনেকগুলো মানদণ্ডের ভিত্তিতে চিহ্নিত করা যায় (Walker, 1999)। আবার অনেকেই মনে করেন অটিজম আর কিছুই নয়, এটা হচ্ছে এক ধরনের মানসিক বিকাশজনিত সমস্যা।তবে, যতই দিন যাচ্ছে সারাবিশ্বে ততই আশঙ্কাজনক হারে অটিজমের প্রকোপ বাড়ছে (Maguire, 2013)। আমেরিকার Centre for Diseases Control and Prevention's Autism and Development Disabilities Monitoring Network (2014) পরিবেশিত এক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে, ১৯৮০'র দশকে প্রতি দশ হাজার লোকের মধ্যে ১ জন অটিজমে আক্রান্ত ছিল। এটা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে পেতে প্রতি ২৫০০ জনে ১ জন, অতঃপর প্রতি ১০০০ জনে ১ জন, ২০১২ সালে প্রতি ৮৮ জনের

মধ্যে ১ জন এবং সর্বশেষ ২০১৪ সালে প্রতি ৬৮ জনের মধ্যে ১ জনকে অটিজমে আক্রান্ত বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে। (The Centre for Disease Controle and Prevention Report, USA, 2007). অপরদিকে যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল অটিস্টিক সোসাইটির ওয়েবসাইটে (www.nas.org.uk) পরিবেশিত তথ্য থেকে জানা যায় যে, ২০০৬ সালে ঐ দেশে মোট ৫,৩৫,০০০ (পাঁচ লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার) জন অটিজমে আক্রান্ত হয়েছিল। অপরদিকে ভারতে পরিচালিত একাধিক গবেষণা/ সমীক্ষা মারফৎ জানা যায় যে, ঐ দেশে ৫০০ জনের মধ্যে ১ জন অটিজমে আক্রান্ত। তাই জনসংখ্যার বিচারে কেবলমাত্র ভারতেই প্রায় ১২ লক্ষ মানুষ অটিজমে আক্রান্ত (www.autism.india.org)। যদিও এই হার জাপান, হংকং এবং কোরিয়ায় ১৪৭। অটিজমের বিস্তার এতটা ভয়াবহ আকার ধারণ করার কারণেই হয়তোবা ২০১২ সালে পরিবেশ ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে অটিজমভিত্তিক গবেষণা সবচেয়ে অধিকবার শিরোনাম হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে অটিজম সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণার উন্মেষ ঘটে ২০০০ দশকের প্রথমার্ধে। এক্ষেত্রে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করে ঢাকাস্থ SWAC (The Society for the Welfare of Autistic Children)। এই প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা হলো সেই সব অভিভাবক যারা প্রত্যেকেই ছিলেন অটিস্টিক শিশুর মাতাপিতা। কালানুক্রমিকভাবে ২০০০ সালের পর ২০০৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় AWF (Autism Welfare Foundation), ২০০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় Proyash (প্রয়াস), ২০০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় Autistic Children's Welfare Foundation, Bangladesh। ইতোমধ্যে ২০০৭ সালের ৮ই ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে গৃহীত ৩২/১৩৯ নং প্রস্তাবনার ভিত্তিতে প্রতি বছরের ২রা এপ্রিল পালিত হচ্ছে বিশ্ব অটিজম দিবস। বাংলাদেশেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কন্যা একজন অটিজম বিশেষজ্ঞ হওয়ায় সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় এবং আন্তর্জাতিক সহায়তায় 'অটিজম' সম্পর্কে বিভিন্ন গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণা শুরু হয় (Hossain, 2011). সর্বস্তরের গণ মানুষের মধ্যে এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। সর্বশেষ পর্যায়ে ২০১০ সালের জুন মাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারি উদ্যোগে উদ্বোধন করা হয় Centre for Neuro Development and Autism in Children এর কার্যক্রম।

'অটিজম'কে ঘিরে বস্তুতঃপক্ষে সমগ্র বিশ্বে এ যাবৎ যত সেন্টার/প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার পেছনে মূল উদ্দেশ্য হলো অটিস্টিকদের উপযোগী শিক্ষা, চিকিৎসা, প্রশিক্ষণ এবং পুনর্বাসনমূলক কর্মসূচি গ্রহণ এবং তা সফলভাবে বাস্তবায়ন করা। এর পেছনে যে প্রকৃত সত্যটি কাজ করে তা হলো অটিজমে আক্রান্ত ব্যক্তি/শিশু কোনো দিন পুরোপুরি সুস্থ্য কিংবা আরোগ্য লাভ করে না কিন্তু একটি বিজ্ঞানসম্মত সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যদি তাদের উপযোগী শিক্ষা, চিকিৎসা, প্রশিক্ষণ এবং পুনর্বাসনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় তা হলে তারা স্বাভাবিক জীবন অতিবাহিত করতে পারে।

অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও অটিজম সংক্রান্ত চিকিৎসা, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম অত্যন্ত ব্যয়বহুল একটি বিষয়। এদেশে পারিবারিক এবং সামাজিকভাবে অটিজমকে এখনও লজ্জা ও কলঙ্কের নিদর্শন হিসেবেই দেখা হয়। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে অটিজমকে গ্রহণ এবং তার মোকাবিলা করা বাংলাদেশের জন্য জটিল একটি চ্যালেঞ্জ। ইতোমধ্যে বাংলাদেশে অটিজমে আক্রান্তের প্রকৃত সংখ্যা নির্ণয়ের প্রয়াস চালানো হয়েছে। বাংলাদেশে অটিজমের প্রকোপ যাচাই সংক্রান্ত বিশ্লেষণে (Situation analysis) (Hossain and Akter, 2008) দেখা গেছে যে, এ ধরনের গবেষণার

কোন অস্তিত্ব নেই। দুঃখজনক হলেও এটাই সত্যি যে, অটিজমে আক্রান্ত প্রকৃত মানুষের সংখ্যা সম্পর্কে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত যেমন সঠিক পরিসংখ্যান নেই, একইভাবে এক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত নিবিড় ও ব্যাপকধর্মী কোনো গবেষণা সমীক্ষাও পরিচালিত হয়নি। এ সব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও অটিজমকে ঘিরে আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি অনেক বেশি উজ্জ্বল। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে গত জুলাই ২০১২ সালে দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলভুক্ত ৭টি দেশের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে আয়োজন করা হয় আঞ্চলিক সম্মেলন এবং এই সম্মেলনে অনুষ্ঠিত আলোচনা ও সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে গৃহীত 'ঢাকা ঘোষণা' যা অটিজমের ইতিহাসে মাইলফলক হয়ে থাকবে। উপরন্ত ২০১৩ সালে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ৬৭/৪২ নং প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়। এ প্রস্তাবনায় অটিজমে আক্রান্ত ব্যক্তি, তাঁর পরিবার এবং তাঁর চারপাশে ঘিরে থাকা সমাজের জন্য কি ধরনের আর্থসামাজিক সহায়তা প্রয়োজন তা বিশদভাবে তুলে ধরা হয়। কোনো রকম আপত্তি ছাড়াই প্রস্তাবনাটি সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। উল্লেখ্য যে, 'অটিজম' বিষয়টিকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরে এটিকে ভিন্ন উচ্চতায় পৌঁছিয়ে দেয়ার স্বীকৃতিস্বরূপ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) সায়মা ওয়াজেদ হোসেনকে জনস্বাস্থ্য বিষয়ে সর্বোচ্চ পুরস্কার 'Award for Excellence in Public Health' এ সম্মানিত করে। এক কথায় বলা যায় অটিজম সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিতে বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের পক্ষে এতদুদ্দেশ্যে গঠিত অটিজম ও নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিসঅর্ডার সংক্রান্ত ৮ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা কমিটির প্রধান সায়মা ওয়াজেদ হোসেন অনন্য সাধারণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন।

সংশ্লিষ্ট সকলেই ইতোমধ্যে সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন যে, অটিস্টিক শিশুদের সহায়তা দানের জন্য প্রচুর অর্থ ও জনসম্পদ নিয়োজিত করা প্রয়োজন। যেসব শিশুরা অটিজমে আক্রান্ত তাদের পারিবারিক প্রেক্ষিত কি, এদের জন্য যেসব চিকিৎসার মডেল উদ্ভাবিত হয়েছে, তা প্রয়োগ করা আর্থিকভাবে কতটা যুক্তিযুক্ত এগুলো নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বস্তুনিষ্ঠভাবে তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে জানার জন্য প্রয়োজন বেশি বেশি করে গবেষণা/সমীক্ষা গ্রহণ করা। গবেষণায় লব্ধ তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে যদি উপযুক্ত চিকিৎসা মডেল গ্রহণ করা হয় তাহলে অটিস্টিক পরিবারের নিকট তা অর্থনৈতিকভাবে যেমন সহজসাধ্য হবে, চিকিৎসা ব্যবস্থাটিও তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে।

বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অটিজমের বিষয়টি একজন মানুষের সমগ্র জীবনের একটি বিষয়। এটা কেবল শৈশবকালীন কোন বিষয় নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে অটিস্টিক শিশুদের জন্য কি ধরনের সেবা দিতে হবে, তাদের জন্য কি ধরনের শিক্ষা ও চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে যা দিয়ে তারা একটি আত্মনির্ভরশীল ফলপ্রসু জীবন অতিবাহিত করতে পারে, এসব বিষয়ে বেশি বেশি গবেষণা পরিচালনা করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন (Shattuck, 2012)। অপরদিকে সামগ্রিকভাবে মনস্তত্ত্বের উপর এ যাবৎ প্রচুর গবেষণা হলেও সুনির্দিষ্টভাবে অটিজমের ক্ষেত্রে গবেষণা সবচেয়ে পিছিয়ে রয়েছে। অটিজম গবেষণার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল এই যে, সাম্প্রতিককালে সরকারি এবং বেসরকারি উভয় উৎসের অর্থায়নেই অটিজম কেন্দ্রিক গবেষণা পরিচালিত হচ্ছে। সরকারি-বেসরকারি কর্তৃপক্ষ যারা অটিজমকেন্দ্রিক গবেষণায় অর্থায়ন করে থাকেন তাদেরকে নিয়মিত ও সম্যকভাবে অবহিত করার জন্যও অটিজমের উপর গবেষণা করার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যারা বর্তমানে অটিস্টিক স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডারে (ASD) আক্রান্ত এবং যাদের মধ্যে অটিজমে আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণগুলো এখনো প্রতিরোধ করা সম্ভব, এই দু'ধরনের ব্যক্তির উপযুক্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা

গ্রহণের জন্য গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা জরুরী। মোদ্দাকথা হলো কি কারণে অটিজম হয়, সেই কারণ তত্ত্বটি (Etiology) এখনো আবিষ্কৃত হয়নি, সেই তত্ত্বটি আবিষ্কারের জন্য প্রয়োজন কারণ অনুসন্ধান এবং তা করতে গেলেও গবেষণা প্রয়োজন।

সাম্প্রতিককালে চিকিৎসক, মনোচিকিৎসক, সমাজকর্মী এবং সামাজিক বিজ্ঞানীগণ একটি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, শিশুর মধ্যে যে মুহূর্তে অটিজম সংক্রান্ত উপসর্গ দেখা দেবে সেই মুহূর্তেই কালবিলম্ব না করে যদি উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, আচরণগত ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষণ এবং উপযুক্ত শিক্ষামূলক কর্মসূচির মধ্যে অটিস্টিক শিশুদের অন্তর্ভুক্ত করা যায় তাহলে তাদেরকে মোটামুটিভাবে কর্মক্ষম ও অনেকটা স্বাভাবিক জীবনযাপনের অধিকারী হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব (Daley, 2004; Conn, 2016)। এ উপলব্ধি থেকেই বাংলাদেশে বেশ কিছু সংগঠন অটিস্টিক শিশুদের সর্বাত্মক সহায়তা প্রদানের জন্য এগিয়ে আসলেও তাদের যে ধরনের বিশেষায়িত জ্ঞান, দক্ষতা, শিক্ষা উপকরণ, কারিগরি প্রযুক্তির চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি জনবল থাকা বাঞ্ছনীয় ছিল তা নেই। এক কথায় বলা যায় বাংলাদেশ এ ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে আছে। অতি সম্প্রতি (১৮ আগস্ট ২০১৫) আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (ICDDRB) কর্তৃক অটিস্টিক শিশু আছে এমন ৩৮৮ জন মায়ের ওপর পরিচালিত এক গবেষণায় ৬৫ শতাংশ মা বলেছেন, শিশুর কারণে তাদের জীবনমান খারাপ হয়ে পড়েছে। প্রতিটি শিশুর জন্য পরিবারের মাসে গড়ে ১৭ হাজার ৮৯০ টাকা খরচ হয়। এর এক তৃতীয়াংশ টাকা টিউশন ফি বাবদ খরচ হয়; তবে ৮৯ শতাংশ মা জানিয়েছেন, শিশুকে স্কুলে দেওয়ার পর তাদের অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি হচ্ছে, কিন্তু ৫৪ শতাংশ মায়ের অটিস্টিক শিশুর লালনপালন বিষয়ে কোনো প্রশিক্ষণ নেই। এসব বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে অটিজমের মতো একটি অকর্ষিত ক্ষেত্রের উপর নিয়মিত গবেষণা পরিচালনার কোনো বিকল্প নেই।

Rudy (2006) অটিজমের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অধিকতর বাস্তব ও বিশ্লেষণভিত্তিক কিছু উদাহরণ উপস্থাপন করেছেন। তাঁর মতে অটিজমে আক্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে কেবলমাত্র সামাজিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও যোগাযোগ রক্ষার ক্ষেত্রেই কম বেশি ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হয় না। তাদের মধ্যে ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও দক্ষতার অভাব রয়েছে। তিনি আরো মনে করেন যে, অটিজমে আক্রান্ত শিশুর মধ্যে কোন কিছু শিখে ফেলার জ্ঞান ও দক্ষতার অভাব রয়েছে। যার ফলে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা সমস্যার সম্মুখীন হয়। এটা স্কুলে লেখাপড়ার ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য তেমনিভাবে কিভাবে হাত ধুতে হয় ও খাবার খেতে হয় এসব ব্যাপারেও প্রযোজ্য। বস্তুতপক্ষে অটিজমে আক্রান্ত শিশুদের মধ্যে কোন কিছু শিখে ফেলার ক্ষেত্রে যে ব্যর্থতা তার বিভিন্ন প্রকার ও প্রকৃতি রয়েছে। শিক্ষা লাভের এক পর্যায়ে অনেকেই একা একা মোটামুটিভাবে তার জীবন চালাতে পারে তবে এক্ষেত্রেও তাদেরকে অন্যের সহায়তা ও নির্দেশনা নিতে হয়। আবার অন্যদিকে এমন অনেকেই রয়েছে যাদেরকে আমৃত্যু বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের সহায়তা ও পরামর্শের ভিত্তিতে বেঁচে থাকতে হবে। যাই হোক, উপযুক্ত এবং সঠিক সামাজিকীকরণের আওতায় আনা হলে অটিজমে আক্রান্ত ব্যক্তিগণ অনেক কিছু শিখতে পারে, করতে পারে এবং নিজেকে মোটামুটি স্বাভাবিক মানুষ হিসেবে উন্নীত করতে পারে।

অটিজমের সঙ্গে আরো কিছু অবস্থা কখনো কখনো জড়িত থাকে। এগুলোর মধ্যে attention deficit hyperactivity disorder, delxia Ges despraxia অন্যতম। অন্যান্য যেসব বৈশিষ্ট্য রয়েছে সেগুলো হলো:

ক) মৌখিক ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিলম্ব ঘটা;

খ) একই ধরনের কথার বার বার পুনরাবৃত্তি/দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও মাংসপেশী উঠানামা ও সঞ্চালনের ক্ষেত্রে পুনরাবৃত্তি;

গ) চোখে চোখ রেখে কারও সঙ্গে কথা বলা/সংযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে সামর্থ্যের অভাব কিংবা একেবারেই অসমর্থতা;

ঘ) অন্য কোন সঙ্গী-সাথীর সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় অনীহা;

ঙ) স্বতঃস্ফূর্ত কোন আচরণ কিংবা কল্পনার মানস জগতে বিচরণ করার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা;

চ) কোন কোন বস্তু এবং ঘটনার অংশ বিশেষের প্রতি অনাবশ্যকভাবে স্থির কিংবা আবদ্ধ থাকা।

আমেরিকান সাইক্রিয়াটিক এসোসিয়েশন অটিজমের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তার ভিত্তিতে সোয়াক (২০০৯) অটিজমের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোকে একত্রিত করেছে এবং সেইগুলোর মধ্যে তিন ধরনের প্রতিবন্ধিতা চিহ্নিত করেছে। এগুলো হলো:

(১ সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিতা (সমাজে চলতে একের সঙ্গে অপরের পারস্পরিক যে ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া করতে হয় তা করার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা);

(২) মৌখিক অথবা অমৌখিকভাবে অর্থাৎ কথা বলে অথবা কথা না বলে যে ধরনের সংযোগ/যোগাযোগ করতে হয় তা করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিতা;

(৩) কোন কোন বিষয়ের প্রতি খুবই সীমিত আকারে আচরণ কিংবা আগ্রহ অথবা একই ধরনের আচরণ ও আগ্রহ নিয়ে নিবিষ্ট কিংবা আটকে থাকা।

উপরে বিধৃত বৈশ্বিক ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত এবং চলমান সে বাস্তবতার নিরিখে এ গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছিল।

মূলতঃ মিশ্র পদ্ধতি (Mixed Method) যেখানে কমবেশি নৃবৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রধান প্রধান কৌশল, যেমন অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ (Participatory Observation), সাক্ষাৎকার, কেসস্টাডি ইত্যাদি থেকে প্রাপ্ত তথ্যউপাত্ত, আবার সেই সব তথ্য ও উপাত্তসমূহ গুণগত এবং পরিমাণগতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে : চূড়ান্ত পর্যায়ে গবেষণালব্ধ ফলাফল থেকে আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছি তা হলো অটিজমের উপসর্গ সম্পর্কে বিদেশে গবেষণালব্ধ ফলাফল অনুসারে যা কিছু বলা হয়েছে বাংলাদেশে অটিজমে আক্রান্ত ব্যক্তি ও শিশুদের উপসর্গ সেই একই রকম।

আমরা অটিস্টিক শিশুর মাতাপিতার কাছে প্রশ্ন রেখেছিলাম কি ধরনের উপসর্গ, লক্ষণ থেকে তাদের মনে হয়েছে যে তাদের শিশুটি অটিজমে আক্রান্ত। অটিজমের উপসর্গ, লক্ষণ সম্পর্কে বিদেশি পত্রপত্রিকা, জার্নাল মূলতঃ বিদেশি নির্ভর ইউরোপীয় আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল থেকে আহরিত ঐসব তথ্যউপাত্তের সঙ্গে বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়ন কামী দেশের অটিজমে আক্রান্ত শিশুদের লক্ষণ, উপসর্গের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখার প্রয়াস নিয়েছি। বস্তুত:পক্ষে অটিজম আকাশে বিরাজমান রংধনুর মতো একধরনের অসুস্থ্যতা যার রয়েছে নানা রং, প্রকার ও প্রকৃতি। কেউ খুবই উচ্চমাত্রায় আক্রান্ত, কেউ আবার অতি সামান্য বিভ্রম

বিচ্যুতি দ্বারা আক্রান্ত। মাত্রা ভেদে অটিজমের শ্রেণি বিভাজন করেছেন চিকিৎসক, গবেষক ও মনোবিজ্ঞানীরা। দেখা যায় যে, উন্নত কিংবা অনুন্নত দেশের অটিজমের লক্ষণের মধ্যে কোন তারতম্য নেই। আমাদের গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৫০ জন অটিস্টিক শিশুর অভিভাবকদের কাছ থেকে সর্বমোট ১০টি উপসর্গ চিহ্নিত করতে পেরেছি। তার মধ্যে ৩ বছর বয়সেও কথা না বলতে পারার উপসর্গটি উল্লেখ করেছেন সর্বোচ্চ সংখ্যক অভিভাবক (৬৭)। আবার ৯/১০ মাস থেকে কথা বলা শুরু করলেও ২/৩ বছর বয়সে কথা বলা বন্ধ করে দেয়। এমন মন্তব্য করেছেন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অভিভাবক।

লক্ষ্যণীয় যে, অটিস্টিক শিশুদের মধ্যে অধিকাংশের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তারা ৩ বছর বয়সের মধ্যে কথা বলতে পারেনা। অন্যের সঙ্গে ভাব বিনিময় বা সংযোগ প্রতিষ্ঠা করতে পারেনা, সেটা চোখে চোখে তাকিয়ে অথবা অন্য কোনভাবে ইশারা ইঙ্গিতে হলেও সংযোগ প্রতিষ্ঠায় তারা ব্যর্থ হয়।

আমরা অনুসন্ধান করে দেখার চেষ্টা করেছিলাম যে, উত্তরাধিকার সূত্রে তথা বংশগতির কারণে আদৌ একটি শিশু অটিজমে আক্রান্ত হয় কিনা। এবিষয়ে অটিস্টিক শিশুদের মাতাপিতা ও অভিভাবকগণ যে তথ্য আমাদের সরবরাহ করেছেন তার মাধ্যমে দেখা যায় যে, ৭০% শিশুর বংশধরগণের মধ্যে অটিজমে আক্রান্ত হওয়ার কোন ইতিহাস নেই। অবশিষ্ট ৩০% এর এধরনের ইতিহাস বিদ্যমান। একজন শিশুর নানার বাবা (প্রপিতামহ), আরেকজন শিশুর দাদার বাবা, তিন জন শিশুর যথাক্রমে দাদা, নানা, নানী এদের মধ্যে অটিজমে আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণ ছিল বলে জানা যায়। অবশিষ্ট দশ জন শিশুর চাচাতো, মামাতো, খালাতো, ফুফাতো ভাইবোনদের মধ্যে অটিজম রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে অটিজমের যথেষ্ট বিস্তার ঘটেছে। এই বিষয়ে কোন অনুসিদ্ধান্তে পৌঁছার আগে পর্যাপ্ত পরিমাণ সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন বলে মনে করা হচ্ছে। নানার বাবা কিংবা দাদার বাবা মা এরা অটিজমে আক্রান্ত ছিলেন বিষয়টি এক ধরনের বিভ্রান্তের সৃষ্টি করে, কারণ হলো ঐসব গুরুজনেরা যখন জীবিত ছিলেন তা ন্যূনপক্ষে ৩/৪ দশক আগের ঘটনা, তখন বাংলাদেশে অটিজম সম্পর্কে কোন ধারণা ছিল তা বিশ্বাস করা কঠিন।

ইতিহাস যে কথা বলে তা হলো উন্নত বিশ্বেও ১৯৪৩ সালের আগে অটিজম সম্পর্কে তেমন কোন ধারণা ছিলনা। যাই হোক, বর্তমান সময়ে দেখা যচ্ছে যে, অটিস্টিক শিশুর জ্ঞাতি ভাই বোনদের অনেকে (প্রায় ১০%) অটিজমে আক্রান্ত। এটা বর্তমান বিশ্বের যে পরিসংখ্যান তার সঙ্গে অনেকটা মিলে যায়। এতদ্সত্ত্বেও আমরা এটা বলতে পারিনা যে, উত্তরাধিকার সূত্রে কিংবা বংশ গতির কারণে একটি শিশু অটিজমে আক্রান্ত হতে পারে।

আমরা গবেষণা শুরুর প্রাক্কালে এমর্মে একটি পূর্বানুমান গঠন করেছিলাম যে, সন্তানটি মায়ের গর্ভে থাকাকালীন শারীরিক কিংবা মানসিক অসুস্থ্যতা, একটি শিশুর অটিজমে আক্রান্ত হওয়ার কারণ হতে পারে। সংগৃহীত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, অটিস্টিক শিশুর মায়েদের মধ্যে ৪২% এর কোন রকম শারীরিক বা মানসিক কোন অসুস্থ্যতা ছিলনা। ১২ জন মা সন্তানটি গর্ভে থাকা অবস্থায় প্রায়শঃই Spotting বা রক্তক্ষরণ জনিত সমস্যায় ভুগেছেন। সমান সংখ্যক মায়েদের কেউ কেউ উচ্চ রক্তচাপ, বহুমূত্র, থাইরয়েড এর সমস্যা Plasenta Previa Bleeding এসব অসুস্থ্যতায় ভুগতেন। ৬ জন মায়ের মধ্যে প্রচণ্ড বমির প্রবণতা ছিল কিন্তু ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তারা পরিমাণ মত পানি পান করতে পারতেন না। অবশিষ্ট মায়েরা আসলে গর্ভাবস্থায় নানা ধরনের মানসিক চিন্তা ও উৎকণ্ঠার কথা উল্লেখ

করেছেন। যেমন স্বামীর প্রতি বিশ্বাসহীনতা (সন্দেহ বাতিক), অনিদ্রা, পুত্র সন্তান হবে কিনা তা নিয়ে উৎকণ্ঠা ইত্যাদি। একজন নৃবিজ্ঞানের ছাত্রী হিসেবে গর্ভকালীন এসব অসুস্থ্যতা সম্পর্কে স্ত্রীরোগ/ধাত্রীবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ এবং মনো চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে। এসব বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের ভাষ্য অনুযায়ী অটিস্টিক শিশুর মায়েরা যেসব সমস্যার/অসুস্থ্যতার কথা উল্লেখ করেছেন তা কমবেশি সকল গর্ভবতী মায়েদের মধ্যেই দেখা যায়। একেবারে আলাদাভাবে এমন কোন বিশেষ সমস্যা কিংবা অসুস্থ্যতার কথা কেউ বলেননি যার মাধ্যমে একটি কার্যকরণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা যায় যে, এ বিশেষ অসুস্থ্যতাই ঐ মাকে একটি অটিস্টিক শিশুর জন্মদানে বাধ্য করেছে।

অটিস্টিক শিশু কি পছন্দ করে, কি পছন্দ করেনা, কাকে পছন্দ করে, কাকে করেনা তার একটি দীর্ঘ তালিকা ৫০ জন অভিভাবকের কাছ থেকে পাওয়া যায়। এদের সবচেয়ে অপছন্দনীয় বিষয় হলো লেখা পড়া করা এবং শারীরিক পরিশ্রম প্রয়োজন এমন কোন কাজ করা। এরা চুল কাটতে, গোসল করতে, দাঁত মাজতে, অন্যদের সঙ্গে খেলতে, নিজের হাত দিয়ে ভাত খেতে একেবারেই পছন্দ করেনা। তার চারপাশের পরিবেশের মধ্যে যদি উচ্চ আওয়াজ বিশিষ্ট কোন শব্দ হয় কিংবা কেউ যদি জোরেজোরে কথা বলে, কেউ যদি তার খেলনা স্পর্শ করে, সে কোন কিছু চেয়েছে প্রতি উত্তরে যদি কেউ না করে আবার পছন্দ মত কোন জিনিস খেতে যদি কেউ নিষেধ করে সেটাও তারা খুব অপছন্দ করে। সবচেয়ে কৌতুহল উদ্দীপক বিষয়টি হলো অধিকাংশ অটিস্টিক শিশু বাইরে ঘুরে বেড়াতে খুব পছন্দ করে, সেটা রিকশায় হোক বা গাড়িতে হোক। তারা চোখের সামনে গতিময় কোন জিনিস দেখতে খুবই পছন্দ করে যেমন টিভি দেখা, টিভিতে প্রদর্শিত স্ক্রল, মোবাইল, কম্পিউটার এসব নিয়ে কাজ করা। একই সঙ্গে তাদের মধ্যে অধিকাংশই গান শুনতে খুব পছন্দ করে। আরেকটি বিষয় তারা খুবই পছন্দ করে সেটা হলো একাকী খেলতে, যেখানে কেউ তাকে বিরক্ত কিংবা উত্যক্ত করবেনা। উল্লেখযোগ্য যে, অটিস্টিক শিশুরা শুধুমাত্র একটি জিনিস পছন্দ করে বা অপছন্দ করে এমন নয়। এ বিষয়ে একাধিক, কখনও কখনও দুই বা ততোধিক উত্তর পাওয়া গেছে। তাই এখানে শতকরা কিংবা গড় হিসাব উপস্থাপন করা হয়নি।

যেসব মানুষ অটিস্টিক শিশুকে আদর করে, ভালবাসে, তাদের সবাইকে এরা পছন্দ করে। এদের মধ্যে বাবা-মা হলেন সবচেয়ে পছন্দনীয় ব্যক্তিত্ব। এর পরেই রয়েছে ভাইবোন, দাদা-দাদী, নানা-নানী, মামা ফুফু এসব ব্যক্তিবর্গ (Barnett, 2013)। অপরদিকে তাদের কাছে অপছন্দনীয় মানুষ হলো তারাই যারা তার পছন্দনীয় জিনিস নিতে দেয় না, পছন্দনীয় কাজটি করতে দেয়না। বাবা তাকে ভয় দেখায়, কাজ করতে বলে, তাকে আদর না করে তার অপর কোন ভাই কিংবা বোন কে বেশি বেশি আদর করে। এদের প্রত্যেককেই সে অপছন্দ করে। যেভাবেই বিশ্লেষণ করা হোক না কেন, এই তথ্য আমাদের আশাবাদী করে তোলে যে অটিস্টিক শিশুকে যতটা সম্ভব সুস্থ্য স্বাভাবিক করে তুলতে হলে যে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্যে তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় সেই প্রক্রিয়ার মূল চালিকা শক্তি হলো মাতা-পিতা। তাদেরকে যদি উপযুক্ত শিক্ষাও প্রশিক্ষণ দিয়ে একজন অটিস্টিক শিশুকে লালনপালন, পরিচর্যা থেকে শুরু করে যাবতীয় দায়িত্ব অর্পণ করা হয় তা হলে অটিস্টিক শিশুর অসুস্থ্যতার প্রকোপ অনেকাংশে হ্রাস করা সম্ভব।

দেখা যায় যে, অটিস্টিক শিশুদের জন্য যে ভিন্ন ধর্মী স্কুল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেখানে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ছাড়াও চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা রয়েছে। এই তথ্যটি সরবরাহ করেছেন চিকিৎসকেরাই

সবচেয়ে বেশি, শতকরা ২০। পত্রপত্রিকা, আত্মীয়স্বজন, সহকর্মী, মূলধারার স্কুলের শিক্ষক এরাও মোটামুটি সমান সংখ্যক হারে (১০) এই তথ্য প্রদান করেছেন। লক্ষ্যণীয় যে, ৪২ ভাগ অটিস্টিক শিশু তাদের অসুস্থ্যতার জন্য কোন রকম ঔষধ সেবন করেনা। অবশিষ্ট ৫৮ ভাগ শিশু নিয়মিত ঔষধ সেবন করে, অধিকাংশ ঔষধই ঘুমের ঔষধ কিংবা ট্রাংকুলাইজার, যেমন ফিলফ্রেশ, ভ্যালেস, সিজোডন, টোপামেক, পাইরল, রিসপোলাক, পারকিনিল। আবার অনেকেই খিঁচুনি ও উচ্চ রক্তচাপ হ্রাস করার জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধ সেবন করে।

অটিস্টিক শিশুদের যেধরনের ঔষধ সেবন করানো হচ্ছে তা আদৌ অটিজম নিরাময় বা প্রশমনে কোন অবদান রাখে কিনা তা জানার চেষ্টা করা হয়েছে। চিকিৎসকগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, এসব ঔষধ শিশুদের মধ্যে অস্থিরতা, উচ্চ রক্ত চাপ ইত্যাদি হ্রাসে সহায়তা করে কিন্তু অটিজম নিরাময়ে কোন অবদান রাখেনা। তারা এমর্মে দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, বিভিন্ন ধরনের থেরাপি যা সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অটিস্টিক শিশুকে প্রয়োগ করা হয় কেবল ঐসব থেরাপিই পারে অটিস্টিক শিশুকে অনেক খানি সুস্থ্য করে তুলতে এবং ভবিষ্যতে নিজের জীবনটি পরিচালনায় সক্ষম করে তুলতে।

এখানে আমরা দেখতে চেষ্টা করেছি কোন্ খাবার টি শিশুরা খেতে পছন্দ করে। এই তালিকার শীর্ষে রয়েছে চকলেট, আইসক্রীম, চিপস্, সব ধরনের ফাস্ট ফুড। এর পরের স্থানে রয়েছে যে কোন ভাজা-ফ্রাই, ভাত, মাছ, পোলাওমাংস ইত্যাদি। অভিভাবকরা এই অভিমত ও ব্যক্ত করেছেন যে, অধিকাংশ শিশু দাঁতের সমস্যায় আক্রান্ত, তাই শক্ত খাবার তারা পছন্দ করেনা। আবার চামচ দিয়ে খেতে তারা পছন্দ করে সেকারণেই শুকনো কিন্তু সুসেদ্ধ ঝরঝরে খাবার তারা খেতে ভালবাসে। কোন খাদ্য ভেজা কিংবা আদ্র হলে তারা নিজ হাতে খেতে চায়না। সব ধরনের খাবারই তারা মায়ের হাতে খেতে পছন্দ করে।

শিশুটি একাকী কি ধরনের কাজ করতে পারে তাও আমরা চিহ্নিত করার প্রয়াস নিয়েছি। দেখতে পেয়েছি যে, মাত্র ১৬ ভাগ শিশু একাকী সবকিছু করতে পারে। কিন্তু ৭ বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত কোন শিশুই কোন কাজ একাকী করতে পারেনা। নিজে নিজে পানি পান করতে পারে এই ধরনের শিশুর সংখ্যা খুবই কম, মাত্র ৬। একাকী খেতে পারে এমন শিশুর সংখ্যা হলো ১৮ ভাগ। টয়লেটসহ অন্যান্য ব্যক্তিগত কিছু পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে পারে মাত্র ৩০ ভাগ। দাঁত ব্রাশ করার ক্ষেত্রে মারাত্মক ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হয়। মাত্র ১২ ভাগ শিশু এ কাজটি করতে পারে। নিজের কাপড় নিজে পড়তে পারে এমন শিশু ১৪ ভাগ। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এখানে যতগুলো কাজের উল্লেখ করা হয়েছে, এই কাজগুলো সম্পন্ন করা একজন স্বাভাবিক শিশুর জন্য সুক্ষাতিসুক্ষ অর্থে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত নয় কিন্তু অটিস্টিক শিশুর জন্য এটা অবশ্যই সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার অন্যতম প্রধান একটি অংশ। লক্ষ্যণীয় যে, ৬ বছর অবধি এসব শিশু কিছুই করতে পারেনা, ৭ বছর বয়স থেকে তারা কোন না কোন কাজ করতে পারছে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অবদান যিনি রাখছেন তিনি হলেন বাবা-মা এবং এরপর তাকে যে স্কুলটিতে ভর্তি করা হয়েছে সেই স্কুলের শিক্ষক, প্রশিক্ষক, থেরাপিস্টসহ আরও অনেকে। সমাজবিজ্ঞান কিংবা নৃবিজ্ঞানের ভাষায় সামাজিকীকরণের মূল লক্ষ্য থাকে একজন শিশুকে পূর্ণ ব্যক্তিত্ববান, দায়িত্ব ও কর্তব্যপরায়ণ নাগরিক ও মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা। আর অটিজম কেন্দ্রিক সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মূল লক্ষ্যই হলো একজন শিশু যেন

মোটামুটিভাবে নিজের জীবনটি নির্বাহ করতে পারে এবং মোটামুটি কর্মক্ষম হতে পারে। তবে যেসব অটিস্টিক শিশুরা (Savant) মহাপণ্ডিত ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন অর্থাৎ তা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হোক, ছবি আঁকা হোক, গণিত শাস্ত্র কিংবা সংগীত শাস্ত্র বিষয়ক কোন ক্ষেত্র হোক, তারা সারা পৃথিবীতে কালজয়ী অবদান রেখে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন, কোন একটি বিশেষ বিষয়ে যে তারা মহাপণ্ডিত (Savant) সেটাও কিন্তু চিহ্নিত করা হয়েছে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই। এক্ষেত্রে মূল ভূমিকাটি পালন করেছেন সামাজিকীকরণের প্রধান প্রধান বাহন (Agent) যেমন বাবা-মা কিংবা শিক্ষক।

শুরুতে আমরা অটিস্টিক শিশুর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাদের মাতা পিতা এবং অভিভাবকদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি এবং সেই পরিকল্পনা প্রণয়নে তাদের আর্থিক অবস্থার কোন প্রভাব আছে কিনা তা নিরূপনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছিলাম। দেখা যায় যে, শিশুর পরিবারের আয়ের সঙ্গে তার মাতা পিতার/অভিভাবকদের ভবিষ্যৎপরিকল্পনার কোন সম্পর্ক নেই।

আসলেই পরিকল্পনার কথা বলতে গিয়ে প্রত্যেক বাবা-মা তাদের নিজের মনের বাসনা, একান্ত আশা-আকাঙ্খার কথাই ব্যক্ত করেছেন। যেমন অধিকাংশ মাতা পিতাই চেয়েছেন যদি চিকিৎসার মাধ্যমে তার সন্তানটি মোটামুটি স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে ও স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারে তাহলেই তিনি সবচেয়ে খুশি হবেন। একজন শিশুর বাবা-মার আশা হলো যেহেতু তার সন্তানটি কথা বলতে পারেনা, সেই সন্তানটি যদি কথা বলতে পারে তাহলে তিনি তাকে কোরআন-এর হাফেজ বানাবেন। আরেক শ্রেণীর অভিভাবক মনে করেন যে, তার সুস্থ্যস্বাভাবিক আরও যে সন্তান রয়েছে তারা যদি তার অটিস্টিক শিশুটিকে সারাটা জীবন একটু আদর যত্ন করে দেখে শুনে রাখে তা হলে তিনি সুখী হবেন। কেউ কেউ মৃত্যুর পূর্বে তার অটিস্টিক সন্তানটিকে একটি নির্দিষ্ট 'হোম' এ রেখে যেতে পারতেন তাহলেও নিজেদেরকে নির্ভার মনে করতেন। এভাবে বিরাট সংখ্যক অভিভাবক নিজেকে নির্ভার মনে করে শান্তিতে দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার আশা ব্যক্ত করেছেন। অনেকে মনে করেছেন যে, চিকিৎসা, যত্ন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সরকারিভাবে যদি ব্যাপক আকারে পুনর্বাসন কর্মসূচি গ্রহণ করা হতো তা হলে সকলের জন্যই তা কল্যাণকর হতো। আবার এক শ্রেণির অভিভাবক রয়েছেন তারা সব কিছুই মহান আল্লাহ্ তায়ালার করুণার উপর ছেড়ে দিয়েছেন। তারা পরিস্কারভাবে উল্লেখ করেছেন, "আমাদের কোন পরিকল্পনা নেই, আল্লাহ্ তায়ালা যা করবেন সেটাই মেনে নেব।"

খুব সম্প্রতি দু'একটি প্রতিষ্ঠান যেমন বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন, প্রয়াস এবং IPNA নিয়মিতভাবে কিছু প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করলেও এসব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কেবলমাত্র অটিস্টিক শিশুদের মাতা ও পিতাদেরকে কাউন্সেলিং সেবাই প্রদান করা হচ্ছে (Begum, 2008)। আশার কথা এই যে, সরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত IPNA অটিজমের ক্ষেত্রে এখন "Apex" সংস্থা কিংবা কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। অপরদিকে সরকারিভাবে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়সহ শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সরাসরি নানাবিধ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। আন্তর্জাতিকভাবে অটিজম মোকাবেলায় বাংলাদেশের সাফল্য বিপুলভাবে প্রশংসিত হলেও আমাদের গবেষণার ফলাফল যা নির্দেশ করে তা হলো এক্ষেত্রে আমাদের অর্জন সামান্যই। এই অবস্থা থেকে আমাদেরকে উত্তরণ ঘটাতে হবে এবং তা দ্রুততম সময়ের মধ্যেই। সেটা করতে গেলে আমাদের প্রধান প্রধান যে কাজগুলো করতে হবে তা হলো;

(১) Neuro developmental প্রতিরক্ষা সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩ এর আওতায় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একটি অংশ হিসেবে অটিজমকে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। অটিজমকেন্দ্রিক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি নীতিমালা ও আইন প্রণয়ন করতে হবে যেখানে অটিজমে আক্রান্ত ব্যক্তি ও শিশুর লালনপালন, পরিচর্যা, শিক্ষা, চিকিৎসা প্রশিক্ষণ, পুনর্বাসন কিভাবে, কোথায়, কাকে দিয়ে করা হবে তা পরিষ্কারভাবে বিধৃত থাকবে।

(২) IPNAএর মতো প্রতিষ্ঠান প্রতিটি জেলা সদরে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

(৩) অটিজম বিশেষজ্ঞ হিসেবে একদল চিকিৎসক, নার্স, থেরাপিস্ট গড়ে তুলতে হবে, প্রয়োজনে তাদেরকে একটি 'ক্রাস' প্রোগ্রামের আওতায় বিদেশ থেকে প্রশিক্ষিত করে আনতে হবে।

(৪) অটিজমের উপসর্গ সম্পর্কে স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ দিয়ে গবেষক বাহিনী সৃষ্টি করে তাদেরকে দিয়ে সমগ্র বাংলাদেশে অটিজম আক্রান্ত ব্যক্তি/শিশুর উপর শুমারি পরিচালনা করে অটিস্টিকদের প্রকৃত সংখ্যা নিরূপণ করতে হবে।

(৫) জাতীয় বাজেটে অটিজমের জন্য স্বতন্ত্র বাজেট বরাদ্দের বিধান রাখতে হবে।

(৬) যেসব অটিস্টিক পরিবার আর্থিকভাবে অসমর্থ্য, সেসব পরিবারগুলোকে প্রতিবন্ধী ভাতার মতো প্রতি মাসে অটিজম ভাতা প্রদান করতে হবে।

(৭) প্রতিটি অটিস্টিক শিশুর মাতাপিতা যেন অটিজম সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ বিনামূল্যে গ্রহণ করতে পারে সে ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

(৮) যেসব স্বেচ্ছাসেবী/বেসরকারি সংস্থা অটিস্টিক শিশুর সামাজিকীকরণ থেকে শুরু করে তাদের লালনপালন, পরিচর্যা, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, পুনর্বাসনের জন্য আগ্রহী হবে এবং এসব কর্মসূচি সফল বাস্তবায়নে নিবেদিত হবে তাদেরকে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও এনজিও ব্যুরোর পক্ষ থেকে সব ধরনের সহায়তা প্রদান করতে এগিয়ে আসতে হবে।

(৯) সমস্ত বিশ্বেই অটিস্টিক শিশুদের লালনপালন, পরিচর্যা, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, পুনর্বাসনের জন্য নির্দিষ্ট একটি স্থাপত্য রীতি অনুসরণ করে ভবন/অবকাঠামো নির্মাণ করা হয় যা কিছুটা অনুসৃত হয়েছে 'প্রয়াস' কর্তৃক, আর কোথাও বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া হয়নি। এ বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে উপযুক্ত নির্দেশমালা জারি করতে হবে।

(১০) সারা পৃথিবীতে অটিজমের ক্ষেত্রে যেসব স্কুল/প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সফলতা অর্জন করেছে সেগুলোর প্রত্যেকটিতে কমবেশি ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক, প্রশিক্ষকের অনুপাত হলো ১:১। যার বাস্তবায়ন সহজ না হলেও বাংলাদেশে এ কার্যক্রম এখন থেকে শুরু করতে হবে।

(১১) সংগত কারণেই প্রতিটি বাবা-মা তার অটিস্টিক সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কিত। অটিস্টিক সন্তানটি সম্পর্কে মাতা-পিতাদের চাওয়ার তেমন বেশি কিছু নেই। তারা শুধু এটুকুই চায় ভবিষ্যতে যেন তারা মোটামুটি আরামপ্রদ একটি জীবন অতিবাহিত করতে পারে। এক্ষেত্রে মাতা-পিতাদের দাবী হলো তাদের মৃত্যুর পরে এই সন্তানটি যেন একটি নিশ্চিত, নিরাপদ জীবন যাপন করতে পারে সেজন্য সরকারের পক্ষ থেকে অটিস্টিক হোম প্রতিষ্ঠা করা। প্রতিটি বিভাগে সরকারের পক্ষ থেকে যেন একটি করে হোম প্রতিষ্ঠা করা হয় সে ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

(১২) যেসব অটিস্টিক শিশু ইতিমধ্যেই Savant হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে এসব শিশুদের যেসব ক্ষেত্রে পারঙ্গমতা, আগ্রহ ও দক্ষতা অসামান্য। যেমন ছবি আঁকা, গান গাওয়া, কোন বিশেষ ইন্সট্রুমেন্ট বাজানো, অংক কষা কিংবা কম্পিউটার কেন্দ্রিক তথ্য প্রযুক্তি এসব বিষয়ে উৎকর্ষতা সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আলাদাভাবে আর্থিক কিংবা আনুষ্ঠানিক/অনানুষ্ঠানিক পৃষ্ঠপোষকতা বা প্রণোদনা দিয়ে তাদের প্রতিভার সর্বোচ্চ স্ফুরণ নিশ্চিত করা। এক্ষেত্রে সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, এনজিওসহ সংশ্লিষ্ট সকল মহলকে এগিয়ে আসতে হবে।

আশা করা যায় উপরের তালিকাভূক্ত কাজগুলির সফল বাস্তবায়ন বাংলাদেশে অটিজম কেন্দ্রিক চিকিৎসা ও পুনবার্সনে ফলপ্রসূ অবদান রাখবে যা অটিজম চিকিৎসা ও পুনবার্সনে বাংলাদেশকে রোল মডেলের মর্যাদায় আসীন করতে সক্ষম হবে।

তথ্যসূত্র

1. American Psychological Association (2014), “Washington DC Intellectual and Developmental Disabilities/Autism Spectrum Disorder”.
2. American Psychiatric Association (2000), “Diagnostic Criteria for Asperger’s Disorder (AD)”, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,* 4th edition.
3. Autism Welfare Foundation (2011), “Occupational Therapy Management for Child with Autism in Kanon”, *An Annual Magazine,* Dhaka, p. 34-35.
4. Barnett, Kristine (2013), The Spark: *A Mother’s Story of Nurturing,Genius and Autism,* Fig Tree, New York, USA.
5. Daley, T.C.& Barua, M. (2008), “Autistic Spectrum Disorders–A Guide for Pediatricians in India”, *Action for Autism*, New Delhi.
6. Begum, Afroza (2008), "Unveiling the Children with Autism: Some Courses of Action to Deal with Them", *The Journal of Social Development,* Vol 20, No. 1, pp. 63-80, Institute of Social Welfare and Research, Dhaka University.
7. Chakrabarti, B; Dudbridge, F; Kent, L; Wheelwright, S; Cawthorne, G Hill; Allison, C; Banerjee, S. Basu; & Cohen, S. Baron (2009) “Genes Related to Sex Steroids, Neural Growth and Social-Emotional Behavior are Associated with Autistic Traits, Empathy and Asperger Syndrome”,
8. Chilvers, R. (2007), *The Hidden World of Autism: Writing and Art byChildren with High-functioning Autism,* Jessica Kingsley Publishers,London, UK & Philadelphia, USA.
9. Conn, Carmel (2016), *Observation, Assessment and Planning in InclusiveAutism Education: Supporting Learning and Development,* Routledge,UK.
10. Daley, T.C. (2004), “From Symptom Recognition to Diagnosis: Children with Autism in Urban India”, *Social Science & Medicine,* 58(7):1323-1335.
11. Freeman, R.D. (2007), “Tic Disorders and ADHD: Answers from a World-wide Clinical Dataset of Tourette Syndrome”, *European Child andAdolescent Psychiatry*, 16 (Suppl. 1), 1/15-1/23.

12. Gallagher, Shawn (2004), "Understanding Interpersonal Problems in Autism: Interaction Theory as an Alternative Theory of Mind", *Philosophy, Psychiatry & Psychology,* Vol. II, Nov. 3, pp. 199-217.

13. Grinker, R.R. (2007), *Unstrange Minds: Remapping the World of Autism,* Basic Books, New York.

14. Hossain, Lokman & Akter, Asma (2008), "Social Concern on Autism: Bangladesh Perspective", *NAEM Journal,* Vol 4, Issue-7, pp. 24-33, Dhaka.

15. Hossain, Saima Wazed (2011), "Solving the Autism Public Health Puzzle – Regional and International Collaboration" paper presented as the Chair of the National Advisory Committee on Autism in Bangladesh at the United Nations Head Quarters on 6 April 2011.

16. Kern, Daniel (2010), *Socialization Problems in Children with Autism,* HDFS 312w.

Knott, F. Dunlop, A.W. Mackay, T. (2006), *Living with ASD: How doChildren and Their Parents Assess Their Difficulties with Social Interaction and Understanding Autism,* 10(6), 609-617.

17. Koegel, L., Vernon, T. Koegel, R.L., Koegel, B., Paullin, A.W. (2012a), "Improving Socialization between Children with Spectrum Disorders", J*ournal of Positive Behavioural Interventions,* 14(4), 220-227.

18. McDermott, R. & Varenne, H. (1995), "Culture as Disability", *Anthropology and Education Quarterly,* 26(3): 324-348.

19. Maguire, Corinne (2013), "Autism on the Rise: A Global Perspective", *Global Health Review, Harvard College,* USA.

20. Mehruba, H. & Amreen, R. (2006), "Autism, 1^0 initiative, 1 dinitiative. wordpress.com/2000/09/

21. Newschaffer, CJ & Curran, LK. (2003), "Autism: An Emerging Public Health Problem", *Public Health Report,* Sep-Oct; 118 (5) : 393-9.

22. Ruble, L & Gallagher, T (2004), "Special Needs Autism Spectrum Disorders: Primer for parents and Educations National Mental Health and Education Centre", National Association of School Psychologists, Health Science Centre, University of Lousville (www.naspcenter.org).

23. Rudy, Lisa Jo (2006), *What Causes Autism?,* About.com, a part of the New York Times Company.

24. Scott, Benson (2016), *What Is Autism Spectrum Disorder?* American Psychiatric Association.

25. Shattuck, P.T.; Narendorf, S.C.; Cooper, B.; Sterzing, P.R.; Wagner, M.; Taylor, J.L. (2012), "Postsecondary Education and Employment Amongociety for the Welfare of Autistic Children (2009), *Autism - A Neuro Development Disorder,* Dhaka.

26. Srivastava, L; Walker, C.D. & Trottier, G. (1999), "Etiology of Infantile Autism: A Review of Recent Advances in Genetic and Neurobiological Research", *Journal of Psychiatry and Neuroscience,* 24(2):103-15.

27. World Health Organization (2006), "Pervasive Developmental Disorders", *International Statistical Classification of Diseases and RelatedHealth Problems,* 10^{th} edition.